ব্লাক ও স্লোগানের দ্বন্দ্ব

জহর সেনমজুমদার

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ব্লাক ও স্লোগানের দ্বন্দ্ব

এ - বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে যাঁরা সমাজ - সচেতন কবিতা লেখেন, তাঁদের রচিত কবিতায় ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের ভাগ কমই থাকে। লড়াকু মানুষের শরীরী প্রতিবাদ দেখাতে দেখাতে তাঁরা সংকটদীর্ণ বহির্বাস্তব নিয়েই বেশি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। সেক্ষেত্রে মানব মনস্তত্বের জটিল নিভৃত ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই বেশ উদাসীনই থেকে যান। এমন সমাজ - সচেতন কবি খুব কমই আছেন -- যিনি একই সঙ্গে বহির্বাস্তব এবং অন্তর্বাস্তব দুই-ই নিয়ে সমানভাবে ভাবছেন। আবার উলটো দিক থেকে এ-ও অনস্বীকার্য যে মূলত সমাজ - সচেতন কবি নন যাঁরা, তাঁরাও কবিতা লিখতে লিখতে মানবমনের গভীরে এমনভাবে ঢুকে পড়েন যে, তাঁরা আবার মানুষের বাইরের লড়াইয়ের কথা ভাববার মতো অবকাশ আর পায় না। ফলে দু-শ্রেণির কবিরাই মানুষকে আংশিক রূপে দেখাতে বাধ্য হন। এভাবেই দু-শ্রেণির কবিদের মানুষ দেখবার দুটি ভিন্নমুখী পথ তৈরি হয়ে গেছে বাংলা কবিতায়। ফলে আমরা যখন সমাজ - সচেতন কবির কবিতা পাঠ কবি, তখন কী কী লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য সেসব কবিতায় পাওয়া যাবে --- তার একটা নির্দিষ্ট ধারণা আগে থেকেই আমাদের মনে তৈরি হয়ে যায়। সেই সূত্রেই সমাজ - সচেতন কবিতা আত্মস্থ করতে করতে আমরা পেয়ে যাই --- মিছিল, মিটিং, প্রতিরোধ, সংগ্রাম। পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক ত্রিয়াজাত কবিতা পাঠের সময়ও আমাদের মন প্রায় প্রস্তুত হয়েই থাকে কী কী পাব তার হিসাব - সহ। সেই সূত্রেই মনস্তাত্ত্বিক ত্রিয়াজাত কবিতা আত্মস্থ করতে করতে আমরা পেয়ে যাই -- সুপ্ত অচরিতার্থ কামনা, বাসনা, স্বপ্ন, যন্ত্রণা, যৌনতা। পাঠক তার পাঠভেদ বা চিভেদ নিয়ে কেউ যান সমাজ - সচেতন কবিতার দিকে, কেউ কেউ চলে যান ওই মনস্তাত্ত্বিক ত্রিয়াজাত কবিতার সুপ্ত সম্মোহনের দিকে। এক্ষেত্রে কবিতাপাঠে পাঠকের মানসত্রিয়াই সবচেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। প্রথম পাঠক সমাজ - সচেতন কবিতা লেখাটাকেই সামাজিক রূপে গ্রহণ করে এই শ্রেণির কবিতাই শ্রেষ্ঠ কবিতা মনে করতে থাকেন। আর দ্বিতীয় পাঠক? শিল্পগুণ খুঁজতে খুঁজতে, শিল্পসংযম খুঁজতে, ত্রমশ এইসব কবিতাকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং মনস্তত্ত্বের বত্র আবর্তে আপন স্বরূপ নিরীক্ষণে মগ্ন হয়ে পড়েন। এই দু- শ্রেণির পাঠকের অবস্থান সম্বন্ধে সব যুগের কবিরাই সতর্ক, সচেতন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় আরও একটা দিক থেকে যখন কোনো সমাজ - সচেতন স্বীকৃত কবি কবিতা লিখতে লিখতে আত্মবিরক্তির কারণে ত্রমশ মানব মনস্তত্ত্বের সুপ্ত জটিলতায় ঢুকে পড়তে থাকেন, তখন তাঁর এই পরিবর্তনে আদৌ সুখী হন না তাঁর পাঠক। পাঠ্য কবি দ্রুত তখন হয়ে পড়েন প্রতিক্রিয়াশীল। আবার যখন কোনো মনস্তাত্ত্বিক ত্রিয়াজাত কবি মনস্তত্ত্বের বিচিত্র স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের একটান ক্লান্তি থেকে মুক্ত হবার আগ্রহে সমাজ - সচেতন কবিতা লেখার দিকে একটু একটু করে ঝুঁকে পড়তে থাকেন তখন তাঁর বিদ্ধেও শিল্পহানির অভিযোগ উঠতে থাকে প্রবলভাবে। প্রথমটির উদাহরণ নজল । দ্বিতীয়টির জীবনানন্দ। সমাজ - সচেতন কবিতা লিখে নজল তাঁর নিজের একটা নির্দিষ্ট কবিপরিচিতি গড়ে তুলেছিলেন। ফলে সেই বিশেষ কাব্যপরিচিতি ভেঙে যেই তিনি লিখলেন চাঁদনী রাত -এর মতো কবিতা এ মোর অহঙ্কার -- তৎক্ষণাৎ তাঁকে নিয়ে গুঞ্জন তৈরি হয়ে গেল। একইভাবে মনস্তাত্ত্বিক ত্রিয়াজাত কবিতা দীর্ঘ সময় ধরে লিখবার পর জীবনানন্দযখনই বেলা অবেলা কালবেলা সৃজনে সময় ব্যয়

করলেন, তখনই তাঁর কবিত্ব নিয়ে চারদিকে সংশয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়ে গেল।

।। দুই ।।

বাংলা কবিতার ধারাবাহিক ইতিহাসে এ-সবই স্বীকৃত সত্য। কবি সুভাষও যে এই সত্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, তা তাঁর কবিতা পড়লেই কিন্তু বুঝতে পারা যায়। তিনি জানতেন সমাজ - সচেতন কবিতা লেখার একটা বড়ো ঝুঁকি আছে। তিনি জানতেন সমাজ সচেতন কবিতা কোনো না কোনো সময় স্লোগানধর্মিতা থেকে নিজের দূরত্ব আর বজায় রাখতে পারে না। এই সূত্রে কালের পুতুল গ্রন্থে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পদাতিক প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু যে সংগত প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন, তা স্মরণযোগ্য

বর্তমান সময়ে উৎকৃষ্ট কবিতায় জনপ্রিয়তার গুণ থাকা এতই দুরূহ যে চড়া গলা শুনলেই আমাদের সন্দেহ জাগে। নজলের উচচস্বরকে শেষ পর্যন্ত ভাবালুতায় অধঃপতিত হতে তো দেখলুম। সৎবুদ্ধিসম্পন্ন কবিকে ফিরতেই হয় স্বল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবীর দিকে, জটিল কলাকৌশলে, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের ব্যঞ্জনায়, যদি তিনিকবি হিসেবে নিজের পূর্ণ বিকাশ প্রার্থনা করেন। জনগণের কবি হতে যাওয়ার এই বিপদ সম্পর্কে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনবহিত নন.... প্রথমে, সরল, চড়াগলায় কবিতা, যা জনপ্রিয় হবার দাবি রাখে, অন্যদিকে জটিল বিন্যাসের সংস্কৃতিবান কবিতা। দু-দিক বজায় রাখা চলবে না, এক দিক ছাড়তে হবে। যদি তিনি বিশ্বাসকরেন যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করাই তাঁর কর্তব্য, তিনি তা করবেন মানুষ ও কর্মী হিশেবেই, কবি হিশেবে নয়। কিন্তু যখন এবং যতক্ষণ তিনি কবি, কবিতার উৎকর্ষই হবে তাঁর সাধনা। হয় তাঁকে কর্মী হতে হবে, নয়তো কবি। তিনি কোন দিক ছাড়বেন?

বুদ্ধদেব বসু নিজে ছিলেন প্রকৃতই কবি। তাই ভেতরে কবিদের সমস্যাকেও তিনি যথার্থভাবে অনুভব করেনিতে পেরেছিলেন। কবি সুভাষের কবিত্বশক্তির প্রতি তাঁর প্রশ্রয়কাতর শ্রদ্ধা ছিল বলেই তিনি একদিকে যেমন তাঁকে সচেতন করে দেবার দায় এই গদ্যে বহন করেছেন, তেমনই অন্যদিকে নির্মূল করে দিতে চেয়েছেন যেকোনো কবির ভেতরে জেগে ওঠা দ্বিধাগ্রস্ততাকেও। কারণ দ্বিধাগ্রস্ততা পরোক্ষভাবে কবির সৃষ্ট কবিতাটিকেও নষ্ট বা দুর্বল করে দেয়। কবি হিসেবে বুদ্ধদেব বসু আসলে মনেপ্রাণেই চেয়েছেন কবি সুভাষ যেন তাঁর অন্তর্গত কবিত্বশক্তির প্রতিসুবিচার করেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় যদি নিছক কর্মী থাকেন, তাহলে তা সামগ্রিকভাবে যে বাংলা কবিতারই ক্ষতি -- এই সত্য অনুধাবনে স্থিতধী সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর কোনো অসুবিধা হয়নি। কারণ তিনি জানেন -- নূতনত্ব আছেসুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথনভঙ্গিতে, তাঁর সংকোচনের ক্ষমতায়। কারণ তিনি জানেন --- যে ছন্দ তাঁর কথাগুলোকে দোলাচ্ছে, নষ্ট হয়নি তার সুমিতি। বুদ্ধদেব বসুর তাই আস্থা তৈরি হয়ে গিয়েছিল কবি সুভাষের প্রতি। শুধু তাই নয়,তিনি আরও খুশি হয়েছিলেন কবি সুভাষের কবিতায় ধবনি অন্বেষণের ঝোঁক দেখে। সুতরাং যে - কবির কথনভঙ্গিরনতুনত্ব আছে, কথা দোলানোর ছান্দিক সুমিতি আছে, ধবনি অন্বেষণের আত্মিক প্রবণতা আছে --- সেই কবির কাব্যক্ষমতার সম্পূর্ণ স্ফুরণ অবশ্যই প্রত্যাশা করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। কবি সুভাষের শিরাফোলানো কবিতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন লিরিক এবং মাত্রাজ্ঞান তিনিই সর্বপ্রথম শনাক্ত করে দিয়েছিলেন, যদিও কাব্যাদর্শের দিক থেকে তাঁর অবস্থান বিপরীত মেতে। কবি সুভাষ নিজের অন্তর্গত শক্তি সম্বন্ধেসচেতন ছিলেন না, এমন কথা কিন্তু বলা যায় না। সচেতন ছিলেন বলেই আমরা দেখি

প্রথমত তিনি এমন কিছু সমাজ - সচেতন কবিতা রচনা করেছেন, যেসব কবিতা সমাজ সচেতন হয়েও শিল্পের সংযমী চিত্রকল্পে রসাত্মক সংক্রমণে সফল ...

দ্বিতীয়ত তিনি এমন কিছু সমাজ - সচেতন কবিতা রচনা করেছেন, যেসব কবিতা সমাজ - সচেতন হয়েও মানুষের অন্তর্গত মনস্তত্বের জটিল স্বরূপ ধারণে সফল...

তৃতীয়ত তিনি এমন কিছু সমাজ - সচেতন কবিতা রচনা করেছেন, যেসব কবিতা সমাজ - সচেতন হয়েও আত্মা সত্তার ধবনি ও প্রতিধবনি সৃষ্টির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফল...

সেক্ষেত্রে অভিনিবেশ সহকারে ওইসব কবিতাগুলোর একটা আলাদা শনাক্তকরণ প্রয়োজন। আর তখনই কিন্তু বোঝা সম্ভব হবে যে, কবি সুভাষ কেবল নতুন সমাজ প্রসবের অকুণ্ঠিত চিৎকারে চিৎকারে নিজস্ব কবিত্বশক্তিরসম্পূর্ণ বিনাশে সমর্পিত ছিলেন না। অনেক কবিতায় আত্মশক্তির ক্ষয় করেছেন ঠিক কথা, তবু তারই মধ্য দিয়ে কোথাও কোথাও এমনভাবে তিনি বার হয়ে এসেছেন, যা দেখে বুদ্ধদেব বসুর মতো আমরাও বলতে বাধ্য হবো তাঁর কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়নি। এবং

এ-ও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এরকম সপ্রশংস সমর্থন তিনি যার-তার কাছ থেকেআদায় করে নেননি, নিয়েছেন বুদ্ধদেব বসুর মতো প্রাজ্ঞ সমালোচকের কাছ থেকে। এইরকম সমর্থন সূচক কবিতা হিসেবে প্রথমেই আমরা যে - কবিতাটি বেছে নিতে পারি, তার নাম - ফুল ফুটুক না ফুটুক। ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে নিউ এজ পাবলিশার্স সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা নামের একটি কাব্যসংকলন প্রকাশ করে। সংকলিত গ্রন্থের একটি অংশের নাম রাখা হয়েছিল। -- ফুল ফুটুক। এই অংশের মধ্যেই গভীরভাবে দীপ্যমান ফুল ফুটুক না ফুটককবিতাটি। এই কবিতাটিকে আমরা বলতে পারি জীবনের দিকে সম্পূর্ণভাবে মুখ ফেরানোর কবিতা। কবিতাটির মধ্যে সামান্য একটু গল্পের নাটকীয় আভাস ক্রমশ এক চিরকালীন জীবনসত্যের দিকে ধাবিত হয়েছে। যেদিক থেকেইকবিতাটি পাঠ করা হোক না কেন, ক্রমান্বয়ে চারটি চবিত্র আমাদের বারবার ঘুরেফিরে এসে দাঁড়ায় এবং মূলত তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করতে করতেই আমরা ক্রমশ এক নিষ্ফল বাস্তবতার চূড়ান্ত দীর্ঘশ্বাসের দ্বারা আচ্ছন্ন হই, আক্রান্তহই। এই চারটি চরিত্র বলতে কারা? কী তাদের সম্যক স্বরূপ? কেমন তাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান? এই প্রশ্নগুলোইআমাদের কিন্তু ফুল ফুটুক না ফুটুক কবিতাটির সঙ্গে আপাদমস্তক জড়িয়ে রাখে। কবিতার কেন্দ্রীয় বিষয়সংলগ্নতা থেকে বার হয়ে এসে, গূঢ় অভীপ্সা থেকে বার হয়ে এসে, গুত্বপূর্ণ চরিত্র তাদের স্ব স্ব অবস্থানগত তাৎপর্য থেকেই আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে সময়, সমাজ ও সমকালের পাঁজর - ফাটানো বেদনারক্তিম স্বরূপকেই। এই চারটি চরিত্র হল

কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো এক মেয়ে
কাঠখোট্টা দড়িপাকানো একটা গাছ
পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া এক প্রজাপ্রতি
কোকিলের ডাক নকলকারী এক হরবোলা

এই চারটি চরিত্র মিলেমিশে, ঘুরেফিরে, একটা গল্প তৈরি করেছে --- ভয়াবহ বেদনার এক গল্প । কী সেই গল্প? আমাদের দেশে মেয়েদের অবস্থা কাল যা ছিল, আজও তা আছে। পুষতান্ত্রিক সমাজে নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার বাধ্যতামূলক কারণে মেয়েদের একান্তভাবেই পুষনির্ভর করে রাখা হয়েছে যুগ যুগ ধরেই। বিবাহবন্ধন সেই সামাজিক নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার মৌলবাদী স্বীকৃতি। যেখানে সবসময় কর্তৃত্ব, ক্ষমতা এবং চূড়ান্ত আধিপত্যবাদের প্রতীক পুষ। বলা যায় -- পুষতান্ত্রিক সমাজে পুষের দিকটাই সবসময় ভারী হয়ে আছে। তাই বিয়ে করবার আগে মেয়ে দেখতে আসা থেকে শু করে নানারকম সুপ্ত আকাঙক্ষা চরিতার্থ করে নেওয়া পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই পুষদের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। পুষের ইচ্ছেকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিতে দিতে আসলে সমাজে নারীর মূল্যকেই হ্রাসকরে দেওয়া হয়েছে পরিকল্পিতভাবে। আমাদের দেশে, আমাদের সমাজে, ছেলেরাই যেন বিয়ে করে--- মেয়েরা তাদের ইচ্ছানুযায়ী পছন্দের অসহায় ক্রীড়নকমাত্র। এই ভয়াবহ সামাজিক সত্য ফুল ফুটুক না ফুটুক কবিতাটির কিন্তু মূল ভাববীজ। এই বৈষম্যের সূক্ষ্ম ফাটল ধরেই ছেলেরা চাহিদাপুরণের গুণবিশিষ্ট বায়োডাটা হাতে মেয়ে দেখতে আসে। চাহিদা পূরণের প্রথম দুটি শর্তেই থাকে শরীরী ক্রিয়াজাত অপমান। কী সেই শর্ত ? প্রথমত মেয়েদের ফর্সা হতে হবে। দ্বিতীয়ত মেয়েকে সুন্দরী হতে হবে। এই দুটি শর্ত পূরণের পর তৃতীয় শর্তের প্রচ্ছন্ন নখদন্ত ক্রমশ স্ফীতহয় পণপ্রথাকে সামনে রেখে। আমাদের নিশ্চয় মনে আছে নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের বলিদান নাটকটি। আত্মযন্ত্রণায়া আত্মদংশনে প্রথম অঙ্কেই যেখানে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা কণাময় তাঁর স্ত্রীকে পিতৃত্বের কান্না শুনিয়ে বলেছিলেন

যখন মেয়ে বিইয়েছ, তখন আমাদের, সকলেরই পোড়া অদৃষ্ট গিন্নি, বড় দুঃখেই মুখে আনছি। কিরণ যখন পেটে, আমি বন্ধুবান্ধবদের বলতুম, যদি মেয়ে হয় তো খাওয়াব, ছেলে হলে খাওয়াব না। গলাবাজি করে তর্ক করেছি, ছেলে - মেয়ে প্রভেদ কি ? কি প্রভেদ -- তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।

প্রথাবদ্ধ সমাজের হাঁড়িকাঠে বলিপ্রদত্ত মেয়েদের বিবাহ আসলে যে সব অর্থেই এক ধরনের অর্থলগ্নীর সুচতুর মাধ্যম --- এই সত্য বুঝে নিয়ে একদা কণাময় আর্তনাদ করে উঠেছিলেন এই বলে যে অবলা বালিকার নিশ্বাসে বাঙ্গালা দেশ জ্বলে যায় না --- দিগদাহ হয় না --- মেয়ের বাপ বিষ খেয়ে মরে না --- মেয়েকে নুন দিয়ে মারে না। গিরিশচন্দ্র নাটকে ব্যবহৃত গানেও এই সূত্রে ধ্রুবপদ তোলেন। লেখেন পাখী কাঁদে ব্যাধের ফাঁদে। কবি সুভাষফুল ফুটুক না ফুটুক কবিতায় ব্যাধকে সরাসরি দেখালেন না, দেখালেন কাকে ? এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়েকে। যার মধ্যে চাপা রয়েছে পুষতান্ত্রিক সম

াজের প্রত্যাখ্যানজনিত নিষ্ঠুর বাস্তবের দীর্ঘকালীন ইতিহাস। যে - কালো, যে - কুচ্ছিত, তাকে লাল কালিতে ছাপা হলদে চিঠির আশাবাদ কে এনে দেবে? যে - কালো, যে - কুচ্ছিত, তাকে গায়ে - হলুদ মাখাবার - সমাজ কে উপহার দেবে? তেমন মানুষ তেমন সমাজ আজও রেলিঙে বুক চেপে ধরে ক্রমাগত খুঁজে চলে আইবুড়ো মেয়েটি। খোঁজে আর হতাশ হয়। খোঁজে আর বিরক্ত হয়। খোঁজে আর প্রাত্যহিক নিষ্ঠুর বাস্তবের আক্রমণে শেষমেষ খেপে গিয়ে বহির্বাস্তবের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দড়াম শব্দে জীবন দেখার একমাত্র দরজাটাই বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। আমরা বলব গোটা কবিতাটির দুটি অংশ। প্রথম অংশ জীবনের দিকে আমন্ত্রণমূলক দরজা খুলে রেখে আইবুড়ো মেয়েটির খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে থ াকা। আশায় আশায় বহির্দৃশ্য পর্যবেক্ষণ। আর দ্বিতীয় অংশ চলমান গতানুগতিক জীবনের মুখের ওপর আমন্ত্রমূলক দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে বারান্দা থেকে ক্ষোভ ও বিরক্তি - সহ নিস্মণ। অর্থাৎ স্বপ্নভঙ্গজনিত বেদনায় সে বহির্দৃশ্যপট থেকে নিজেকে নিপায়ভাবে সরিয়ে নিচ্ছে। রেলিঙে বুক চেপে যতক্ষণ সে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, ততক্ষণ বহির্দৃশ্যের খুঁটিন াটির ভেতর সেযেন তার স্বপ্নপূরণের প্রত্যাশাটুকু নিঃশব্দে জমা রাখাছিল। ফুটপাত যতই শানবাঁধানো রুক্ষ হোক, গলির ভেতরটা যতই মৃত্যুলাঞ্ছিত অন্ধকারাচ্ছন্ন পটভূমির জন্ম দিক না কেন --- আইবুড়ো মেয়েটির মনের কোথাও একটুখানি আশা নিশ্চয় ছিল। হয়তো কেউ আসতে পারে, হয়তো কেউ আসবে, ওই ফুটপাত ধরে। ওই মৃত্যুলাঞ্ছিত পটভূমি পার হয়ে। কিন্তু বাস্তব সত্য কেউ আসেনি। ববং উলটে যেন কিছুটা ব্রিদূপ করতেই মেয়েটির কালো কুচ্ছিত গায়ে উড়েএসে জুড়ে বসেছে লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি। আমাদের দেশের লোকায়ত বিবাহ - ভাবনার সঙ্গে প্রজাপতির একটাঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। লোকপ্রবাদ এই যে গায়ে প্রজাপতি বসলে দ্রুত বিয়ের ফুল ফুটে ওঠে। কিন্তু আশাভঙ্গজনিতবেদনায় বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকে আসা মেয়েটি ততক্ষণে বুঝতে পেরে গেছে যে এই প্রজাপতি কোনো শুভসংবাদ বা সুসংবাদ বহন করে অ ানছে না তার প্রাত্যহিক গ্লানিময় মলিন জীবনে। বরং প্রজাপতি যেন - বা একটা ব্যঙ্গের প্রতিনিধি, সাময়িক মিথ্যের বিভ্রম, উড়ে এসে জুড়ে বসে সে আইবুড়ো মেয়েটির অভিশপ্ত জীবনের গায়েই নগ্নভাবে হুলফোটাচ্ছে আর সর্বজনসমক্ষে তার নিরানন্দ অবস্থানটাকে আরও হেয় করে তুলছে, আরও প্রকাশ্য রূপ দিচ্ছে।তার জীবনটাকে এমনভাবে হাস্যকর করে তে ালবার কারণটা কী? তার জীবনটাকে এমনভাবে অপদস্ত করবারই বা করণটা কী? সুতরাং সাময়িক বিভ্রমের লজ্জার ক াছ থেকে নিজেকে বাঁচাতে, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির নির্বোধ দাঁড়িপাল্লাটারকাছ থেকে নিজেকে সরাতে, মেয়েটি প্রচণ্ড ক্ষোভে পৃথিবীর দিকে খুলে রাখা দরজাটা বন্ধ করে দিল। এছাড়াসে কী আর করতে পারে? কি-বা করার আছে তার? এই স ামগ্রিক অর্থউদ্ভাসের দিকে তাকিয়ে আমরা বলতে পারি ফুল ফুটুক না ফুটুক কবিতাটি আসলে দরজা খুলে রাখা এবং দরজা বন্ধ করে দেবার চুড়ান্ত কবিতা। বলিদান নাটকে কণাময়ের মতো অসহায় পিতারা যেসব মেয়েদের বিষ দিয়ে ম ারতে পারেনি, নুন দিয়ে মারতে পারেনি-- এই কবিতার কালো কুচ্ছিত হতশ্রী আইবুড়ো মেয়েটি যুগের অন্ধকারে আটকে পড়া সেই মেয়ে। কবি সুভাষ তাকে দেখলেন, তাকে দেখালেন। আর তারই জন্য একটি আশাবাদী প্রেক্ষাপট রচনা করব ার তীব্র তাড়নায় বলে উঠেলেন

ফুল ফুটুক না ফুটুক

আজ বসন্ত

কিন্তু বসন্ত কোথায়? আমাদের সমাজে, আমাদের বাস্তবে, সত্যিই কি বসন্ত কোথাও আছে? এই প্রশ্ন থেকেই আজ কবিতা টির নতুন এক পাঠ আবশ্যক হয়ে পড়েছে। দুই বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিপন্ন সমাজের মধ্য দিয়ে যখন মানুষের হৃৎপিণ্ড গড়িয়ে চলেছে হাহাকার করতে করতে, কবি সুভাষ তখন সেই প্রত্যক্ষ বাস্তব থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকতে পারেননি। দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, দাঙ্গা, দেশভাগের বেদনা আত্মসাৎ করে তিনি তখন ময়দানের পাশ দিয়ে দোতালা বাসে করে যেতে যেতে দূরে ল াল কৃষ্ণচূড়া গাছ দেখছেন আর উন্মুখ হয়ে উঠছেন সমাজ ও বাস্তবের কালোকুচ্ছিত পরিবেশে কোনো এক চিরস্থায়ী বসন্তের আবির্ভাব দেখবেন বলে। সমাজ, সময় ও সমকালের কালেকুচ্ছিত রূপ দূর হবে কী করে যদি বসন্ত না আসে? তিনি তাই একটা বসন্ত পেতে চাইলেন, মনেপ্রাণে একটা বসন্ত পেতে চাইলেন, যে-বসন্ত এলে আইবুড়ো মেয়েটির (যার পরিচয় দিতে গিয়ে কবি সুভাষ কালপুষ পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন বিষণ্ণ ও উদ্বাস্তু। কবিতায় অবশ্য শব্দদুটি তিনি সরাসরি ব্যবহার করেননি।) স্বপ্নপূরণের সিলেবাসআবার আলোয় ভরে উঠবে। আবার ফুলে ভরে উঠবে। বোঝা যায় যে তিনি সমাজ ও সময় ও সময়কালের ঔপনিবেশিক উদ্‌বাস্তু জীবনকে কালোকুচ্ছিত মেয়েটির মধ্য দিয়েই

যেন-বা প্রতিফলিত করতে চাইছেন। আর প্রতিফলিতকরতে চাইছেন বলেই তিনি বসন্তকে আক্ষরে কাজে লাগাতে চেয়েছেন বারবার। কারণ বসন্ত তাঁর কাছে উজ্জ্বলঊষার ঠিকানা। শুর দিকে পদাতিক আলাপ পর্যায়ে বার্ষিক অংশে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন --- বসন্ত সত্যিই আসবে? কী দরকার এসে? তখনও পর্যন্ত বসন্ত তাঁর কাছে কোনো স্থায়ী আশাবাদের প্রতীক হয়ে ওঠেনি। ফলে বসন্তেরআসা না-আসার গুত্বও ছিল না তাঁর কাছে। কিন্তু ফুল ফুটুক না ফুটুক কবিতাটি ভাবতে ভাবতে, লিখতে লিখতে,১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬, থিতিয়ে থাকা সুপ্ত চৈতন্য জাগাতে জাগাতে, তিনিও এক সম্পূর্ণ বসন্তের প্রত্যাশায় বদলে দিতে চেয়েছিলেন চারপাশের নিরানন্দ বাস্তব। এই সুপ্ত প্রত্যাশার সূত্র ধরেই এই কবিতাটির প্রথম পঙ্‌ক্তিটি ফুল ফুটুক না ফুটুক / আজ বসন্ত এমন ঘোষিত প্রত্যয়ের মধ্যে দিয়ে বার হয়ে এল। আমরা ঘোষিত প্রত্যয় ভাবছি কেন, তারও কারণ আছে। শানবাঁধানো রসকষহীন ফুটপাতে কাঠখোট্টা এক গাছে কচি কচি পাতা উঠেছে। তার মানে কিবসন্ত এসেছে? কালো কুচ্ছিত আইবুড়ো এক মেয়ের গায়ে রঙিন প্রজাপতি উড়ে এসে বসেছে। তার মানে কি বসন্ত এসেছে? গায়ে হলুদ দেওয়া বিকেলে একটা হরবোলা ছেলে কোকিলের ডাক ডাকছে। তার মানে কি বসন্ত এসেছে? আসলে আমরা বলব বসন্ত কোথাও নেই, বসন্ত কোথাও ছিল না, বসন্ত কোথাও আসেওনি। এই কবিতাটি সব অর্থেই ছদ্মবেশী বসন্তকালের কবিতা। নকল বসন্তকালের কবিতা। এবং এই অমোঘ সত্যটি সমগ্র কবিতায় আমাদের ধরিয়ে দেয় হরবোলা ছেলেটা। কবিতার মধ্যে তার প্রাসঙ্গিক অবস্থান এবং সংযোজনই আমাদের বলে দেয় যে আমরা এক নকল বসন্তের বিভ্রমে আবদ্ধ হয়ে আছি। এই চেতনাসূত্রে হরবোলা ছেলেটাই হয়ে ওঠে কবিতাটির অন্তর্নিহিত ভাবব্যঞ্জনার মূল চাবিকাঠি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, যা লিখেছি তার সবটাই কি সত্যি? সত্যি বলতে গেলে, শেষ যখন লিখেছি তখন এত কিছু হুঁশ ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কলকাতার রাস্তায় দেখা সেই হরবোলা ছেলেটা ছিল জাতে নেপালী। একটু পাগলাটে ধরনের। সাদার্ণ এভিনিউ তখনও হয়নি। তার মুখটাতে এক একতলা বাড়িতে থাকতেন এক ফুর্তিবাজ পালোয়ান গোছের বাঙালী ক্যাপ্টেন। বাড়ির সামনে গরমের সন্ধেয় চেয়ার পেতে তাঁর আসর বসত। সেখানে রাস্তা থেকে মাঝে মাঝে ডেকে আনা হত সেই হরবোলা ছেলেটাকে। কিন্তু এ সবই তো টুকরো টুকরো পরস্পরবিচ্ছিন্ন ছবি। কেনইবা তাদের এই কবিতায় উড়ে এসে জুড়ে বসা? লিখেছি বেহুঁশ হয়ে। কবে কখন কেন কোথায়-এসব কোনো সওয়াল তখন ছিল না। আজ যেটা মনে করতে চেষ্টা করছি, তার খানিকটা কি মনগড়া অনুচিন্তা নয়?

(দ্রষ্টব্য কবিতার বোঝাপড়া)

কবিতার মধ্যে হরবোলা ছেলেটা অন্তত উড়ে এসে জুড়ে বসেনি --- একথা জোর দিয়েই আজ আমরা বলতে পারি। কেন বলতে পারি? কবিতার ভেতর একটু তলিয়ে গেলে, দেখা যাবে, পয়সা পেলে এই হরবোলা ছেলেটাকোকিলের ডাক নকল করে শোনাত। আগত বসন্তকালের সঙ্গে কোকিলডাকের একটা ঘনিষ্ঠসম্বন্ধআছে, আমরা সবাই জানি। কারণ কোকিলডাক শুনলেই আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠে ধরে নিই --- আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। বসন্তকাল এবং কোকিলডাক মূলত অভিন্নহৃদয়, একে অপরের পরিপূরক। শীতকালীন নিঃস্বতা এবং রিক্ততার কামড়ে গোটা পৃথিবী যখন শ্রীহীন ক্ষতস্থান নিয়ে জড়বৎ, ঠিক তখনই কোকিলডাক চতুর্দিকে একটা উৎসাহের অন্তঃশীল প্রবাহ তৈরি করে দেয়। এই কবিতাতেও কবি সুভাষ কোকিলের ডাক শোনালেন, তবে সে ডাক আরণ্যক পটভূমিসংলগ্নকোনো কোকিলের নয় --সে ডাক নকল, কৃত্রিম, বানানো। পয়সা পাবার বিনিময় হরবোলা ছেলেটা কোকিলের ডাকশুনিয়েছে। আর আমার ? এই ডাক শুনে হর্ষ পেয়ে পুলক পেয়ে ভেবে নিয়েছি ফুল ফুটুক না ফুটুক / আর বসন্ত । কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো ওই মেয়েটাও তো আমাদের অংশ। আসল ও নকলের তফাত আমাদের মতো সে-ওবুঝতে পারেনি। হয়তো তাই মনের ভেতর আশাগুলো মরে যাবার পরও কোকিলের ডাক শুনতে পেয়ে নতুন আশার জন্ম দিতে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল সে কিন্তু যেই সে বুঝতে পেরেছে যে পার্থিব প্রেক্ষাপটের কোথাও কোনো আসল কোকিল ডাকছে না, পয়সা দিতে হরবোলাকে কোকিলডাক ডাকানো হচ্ছে কৃত্রিমভাবে --- তৎক্ষণাৎ সে দড়াম করে পুনরায় দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু হরবোলা ছেলেটা, যে-নাকি কোকিলডাক ডেকে হর্ষ জাগাত মনে, সে-ও কি নিজেকে বাঁচাতে পেরেছে দ্বিযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, প্লাবন, দেশভাগের কুৎসিত দিনগুলোর কাছ থেকে? সে - ও তো ওই বীভৎস দিনগুলোরই শিকার হয়েছে। কোকিলের ডাক ডেকে, বসন্তের আবহ তৈরি দিয়েও, সে যে সত্যিকারের কোনো বসন্ত চারিদেকের কোথাও সৃষ্টি করতে পারেনি -- তার নিজের জীবনই

তার চূড়ান্ত উদাহরণ। কবি সুভাষ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন -- তাকে ডেকে নিয়ে গেছে দিনগুলো। বসন্ত যদি সত্যই আসত, সত্যই থাকত, তাহলে কি হরবোলা ছেলেটাকে এইভাবে চলে যেতে হত ? বসন্ত ও কোকিলের জোড় কোনোদিনও খুলে যায় না। বসন্ত ধরে রাখে কোকিলকে, আর কোকিল ধরে রাখে বসন্তকে। কিন্তু ও হরবোলা ছেলেটার মধ্যে তো এমন আত্মিক জোড় ছিল না। কৃত্রিম ডাক ডেকে এই জোড় তো তৈরি করা যায় না। আবার প্রকৃত কোকিলও হওয়া যায় না। শ্রদ্ধেয় কবি ও সমালোচক শঙ্খ ঘোষ অবশ্য এমনটা ভাবেননি তাঁর মূল্যবান গদ্যে। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত কবিতা পরিচয় গ্রন্থে ফুল ফুটুক সুভাষ মুখোপাধ্যায় নামক একটি মন্ত্রস্নিগ্ধ গদ্যে তিনি বহুকৌণিক ভাবনা থেকেই কবিতাটির ওপর আলো ফেলেছেন, কিন্তু হরবোলা ছেলেটাকে খুব বেশি গুত্ব ধারেননি। তিনি বলেছেন গদ্যের দু - জায়গায় তিনি দু-বার হরবোলা ছেলেটার কথা বলেছেন। প্রথমবার বলেছেন

অতঃপর দেখা দিচ্ছে বাস্তব জীবনযাত্রার চলচ্চিত্র। অন্ধকার ও মৃত্যুতে মাখানো দিনগুলো চলে যাচ্ছে,কোকিলডাকা হরবোলা ছেলেটাও হারিয়ে যাচ্ছে সময়ের মধ্যে, আর এইসব ভাবনা ভাবছিল এ গলির কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে। পরবর্তী পর্বে, আলোচনা যখন আরও ঘন ও সংহত হয়ে উঠেছে, তখন শঙ্খ ঘোষ আবার অত্যন্ত তাৎপর্য স্বরে বলেছেন যে হরবোলা ছেলেটিকে আর দেখা যায় না এখন, প্রেম (কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত) ও কণার (একটা দুটো পয়সা পেলে) চিহ্ নিয়ে সরে যাচ্ছে জড়ত্বময় দিনগুলোর টানে --- সেখানে পৌঁছে আরেকটু বিশেষ ছবি ধরা পড়ল, কিন্তু এখনও কবিতার কেন্দ্রে আসিনি।

বোঝাই যাচ্ছে, কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়েটার ইচ্ছাপূরণের ছবি কিংবা মরীচিকার মতো অপ্রাপণীয় চরিতার্থতার স্বপ্নের সঙ্গে কৃত্রিম কোকিলডাকা হরবোলা ছেলেটার কোনোরকম সংযোগের কথা ভাবেননি। উভয়ের মধ্যে কোনো আন্তঃসম্পর্কও আছে --- এমন ভাবনার দিকেও যাননি। কিন্তু আজ আমাদের কাছে কবিতাটির এই বিশেষ অভিনব দিকটাই ত্রমশ ত্রমপ্রসারিত হয়ে অন্য এক অর্থভাবনার ভাষ্য তৈরি করে দিচ্ছে। কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়েটার অন্তর্জীবনে কোনো বসন্ত ছিল না। কোকিলের ডাক শুনে সে ভেবেছিল বাইরে বুঝি বসন্ত এসেছে। কিন্তু বহির্জীবনেরও কোথাও কোনো ছিল না -- ছিল এক নকলনবীশ হরবোলার উপস্থিতি। অন্তর্জীবন বেং বহির্জীবনের এই নিদাণ প্রতিত্রিয়া থেকেই লেখা হয়েছে ফুল ফুটুক না ফুটুক কবিতাটি। পড়তে পড়তে আমাদের বারবার মনে পড়ে যায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের দশমী কাব্যগ্রন্থের প্রতীক্ষা কবিতাটি, যেখানে লেখা হয়েছিল

পাতী অরণ্যে কার পদপাত শুিন ?
জানি কোনওদিন ফিরবে না ফাল্গুনী
তবে অঞ্জলি উদ্যত কেন পলাশে ?
বনের বাহিরে ক্ষওয়া মাটি ধূ ধূ করে,
নেই ফসলের দুরাশাও অম্বরে,
যা ছিল বলার, কবে হয়ে গেছে বলা সে ...

এই কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন -- আরণ্যক পটভূমি সবসময় ব্যগ্র এবং উৎকণ্ঠিত। কখন আসবে ? কখন আসবে বসন্ত ? সে - বসন্তকে আবাহন বা অভ্যর্থনা করবার জন্য পলাশ ফুল নিয়ে অঞ্জলি দিতে প্রস্তুত। স্বাস্থ্যহীন অরণ্য ভালো করেই জানে যে একমাত্র বসন্তের সংস্পর্শেই তার বন্ধ্য শরীর পুনরায় যৌবন দ্বারা পুনর্গঠিত হতে পারে। বসন্ত ছাড়া সে রিক্ত, সে ক্ষরিষ্ণু। বসন্ত এলেই সে ফিরে পাবে তার যৌবন তার যৌবন, তার উল্লা, তার সঞ্জীবনী, তার প্রণশক্তি। কিন্তু এলেই সে ফিরে পাবে তার যৌবন, তার উল্লস, তার সঞ্জীবনী, তার প্রাণশক্তি। কিন্তু এক নিরপেক্ষ ভাষ্যকার রূপে কিছুটা বেদনার্ত স্বরেই কবি সুধীন্দ্রনাধ আমাদের জানালেন যে আরণ্যক পটভূমি যতই ওপর - ওপর প্রতীক্ষা এবং তলে - তলে প্রস্তুতি নিক -- বসন্তকাল আর ফিরে আসবে না কোনোদিন। ফিরে আসবে না আমাদের জীবনে, আমাদের বাস্তবে। অ

াধুনিক মূঢ়তার নাগরব্বিই ফিরতে দেবে না তাকে। যন্ত্র ও বিজ্ঞানের সঙ্গদোষে আমাদের এই নগরব্বি প্রগৃতিকে হত্যা করেছে এবং সমগ্র পৃথিবীকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করে এক বন্ধ্যা জীবনের অংশীদার করে তুলেছে আমাদের প্রত্যেককে। যুদ্ধ আর রণরক্তের কৃত্রিম প্রগতির মাঝখানে বিভ্রান্ত আমরা একে একে হারাচ্ছি আমাদের প্রকৃতি, আমাদের বসন্ত, আমাদের রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনা। সুতরাং সুধীন্দ্রনাথ, একান্ত নিপায়, জানালেন যে আমাদের কৃত্রিম প্রগতি আছে মাত্র, কিন্তু সৃষ্টিশীল বসন্তের কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই। আমরা যে অরণ্য দেখছি, সে পাতী অরণ্য। পাতী কথাটার অর্থ পতনশীল। অরণ্য পতনশীল কেন ? কারণ তার গোড়া থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। আর মাটি সরিয়ে নিচ্ছে পরমাণু - নিয়ন্ত্রিত ব্বিযুদ্ধ। চ ারপাশে এমন সামগ্রিক বন্ধ্যাত্ব দেখে স্বয়ং বসন্তও আসবার পথ ভুলে গেছে। সুতরাং পতনশীল অরণ্য, পতনশীল জীবন আর পতনশীল মানুষ দেখতে দেখতে সুধীন্দ্রনাথ স্পষ্ট উচচারণ করেছেন --- জানি কোনওদিন ফিরবে না ফাল্গুনী। ঠিক এই সবিশেষ পঙ্‌ক্তির বিদ্ধেই যেন-বা দাঁড়িয়ে আছে কবি সুভাষ সৃষ্ট পঙ্‌ক্তি -- ফুল ফুটুক না ফুটুক / আজ বসন্ত। সুধীন্দ্রন াথের নেই - কে আছে করে তুলবার অভিপ্রায়েই তিনি বসন্ত দেখালেন দড়িপাকানো একটা পাঠখোট্টা গাছের মধ্যে দিয়ে। লিখলেন

শান - বাঁধানো ফুটপাথে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।

যাবতীয় প্রতিকূলতা অস্বীকার ও অতিত্রম করেই অঙ্কুরিত কচিপাতার জীবনের কথা বলছে, বসন্তের কথা বলছে। পতনশীল বিশ্ব কবি সুভাষ তাঁর ও আশাবাদ সঞ্চার করে দিলেন এই কাঠখোট্টা গাছে। আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে, মৃত্যুর কোলে মানুষকে ত্রমাগত শুইয়ে দিয়ে, যেসব কালো দিন উদ্‌বেগ ও আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল --- কবি সুভাষ মনেপ্রাণে চেয়েছেন সেই দিনগুলো যেন আর না ফেরে। আর এজন্যই তিনি পৃথিবীর কেন্দ্রে, বহির্জীবনে, কাঠখে াট্টা গাছের লড়াকু উপস্থিতির মধ্য দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন -- বাস্তব যতই কঠিন ও প্রতিকূল হোক, যেকোনো লড়াকু সত্তা লড়তে লড়তে পৃথিবীতে ফুল ফোটাবেই। বসন্ত আনবেই। পারিপার্শ্বিক সব প্রতিবন্ধকতা একসময় কেটে যেতে বাধ্য, যদি নিজের সত্তাকে লড়াকু ও সত্রিয় রাখা যায়। গাছটা সমস্ত কবিতায় সেই লড়াইয়ের প্রতিচ্ছবি অব্যাহত রেখেছে। কবি সুভ াষ এই গাছটা সম্বন্ধে যে - তথ্য আমাদের দিয়েছেন, কবিতাসংগ্রহ ১ পরিশিষ্ট অংশে তা মুদ্রিত। তিনি জানিয়েছেন -- শ ানবাঁধানো ফুটপাতে কাঠখোট্টা গাছ কলকাতায় আকৈশোর দেখছি। কিন্তু কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে হাসতে দেখেছিলাম যে গাছটাকে -- সেটা ছিল ময়দানে। ট্রামে যেতে যেতে দেখেছিলাম। সম্ভবত ৫২ সালে। বোঝা যায়, বাস্তবে দেখা এই গাছটাই বসন্তপ্রত্যাশীত কবি সুভাষের হৃদয়জগতে এক তুমুল উৎসাহের সঞ্চার করেছে। যাবতীয় নাগরিক নিষ্পেষণ সহ্য করেও যে-গাছ এমন কচি পাতার সমাহারে পাঁজর ফাটিয়ে হাসতে পারে, সেই গাছকে ময়দান থেকে তুলে এনে কবিতার প্রাণকেন্দ্র আশাবাদের প্রতীকী তাৎপর্য ব্যবহার করাটা কবি সুভাষের সামগ্রিক জীবনানুরাগেরই আশ্চর্য স্ব াভাবিক পরিচয়। এই একটি অবস্থানগত লড়াকু উদাহরণ থেকেই কবি সুভাষ যেন একদিকে ব্লাক ও ব্লাগানের দ্বন্দ্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পেরেচেন, অন্যদিকে তেমনই কাঠখোট্টা গাছ ও কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ের জীবনভাবনার প্রভেদসূত্রে উভয়ের অন্তর্গত দ্বন্দ্বকেও স্পষ্টতা দিয়েছেন। সমগ্র কবিতায় কাঠখোটাটা গায বলেছে স্বপ্নের কথা, লড় াইয়ের কথা, হার না মানা ঋজু অভিব্যক্তির কথা। আর সমগ্র কবিতায় কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে কিছু না পাওয়া অচরিতার্থ জীবন প্রকাশ্য বাস্তবতায় মেলে ধরে আমাদের ত্রমাগত একটা কথাই বলে যাচ্ছে --- জানি কোনওদিন ফিরবে না ফাল্গুনী। কারণ সে তার আত্মিক আয়নায় বসন্ত প্রতিফলিত সার্থক জীবনের কোনো ছবিই নতুন করে আর ফুটে উঠতে দেখেছে না। কবিতার একদিকে তাই রয়েছে ফুল ফুটুক না ফুটুক / আজ বসন্ত -র পৌষময় স্বীকৃতি, অন্যদিকে রয়েছে আ-মরণ আর্তনাদের প্রচ্ছন্ন বিরক্তিতে ভরা দেবনার্ত স্বীকারোক্তি। এ যেন সত্যি ও মিথ্যের লড়াই। এই লড়াই দানা বেঁধে উঠেছে, এই লড়াই পরিপুষ্ঠ হয়ে উঠেছে, কোকিলডাকা হরবোলা ছেলেটার জন্যই। সে-ই তার অসামান্য অনুকরণের

দক্ষতায় মিথ্যেকে সাময়িক সত্যিতে পরিণত করে দিয়েছিল বলেই আইবুড়ো মেয়েটির মতো আমরাও ভেবে নিয়েছিলাম বহির্বিশ্ব বুঝি - বা সসন্ত এসে গেছে। কিন্তু কোথায় বসন্ত ? কালো দিনগুলো সেই হরবোলা ছেলেটাকেই শুধু ডেকে নিয়ে যায়নি, তার সঙ্গে নিয়ে গেছে বসন্তকালীন জীবনের জোড়া - বাঁধা চিরকালীন অভীপ্সাকেও। এক মিথ্যা প্রেক্ষাপটের স ামনে তাই আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি আমাদের প্রিয় ওই আইবুড়ো মোর। হরবোলা ছেলেটা তাকে সত্যি - মিথ্যের প্রভেদ বুঝতে দেয়নি। কিন্তু সেই প্রভেদ যখন স্পষ্টভাবে অনুভূত হল তার ছন্দহীন অন্তর্জীবনে, তখন বহির্বিশ্বে এবং মেয়েটর ম াঝখানে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে রইল একটা বন্ধ দরজা। আগ্রসী সত্যের বন্ধ দরজা। কবি সুভাষের এই কবিতাটি যেমন একদিকে আমাদের, সুধীন্দ্রনাথের প্রতীক্ষা কবিতাটি স্মরণ করায়, তেমনই অন্যদিকে চকিতে মনে পড়ে যায় জীবনানন্দ রচিত মহাপৃথিবী কাব্যগ্রন্থের শীতরাত কবিতার বিশেষ কিছু পঙ্‌ক্তি

এদিকে কোকিল ডাকছে -- পাউষের মধ্যরাতে,
বেদনা একদিন বসন্ত ফিরবে বলে -- ?
কোনো একদিন বসন্ত ছিল, তারই পিপাসিত প্রচার ?
তুমি স্থবির কোকিল নও? কত কোকিলকে স্থবির
হয়ে যেতে দেখেছি, তারা কিশোর নয়,
কিশোরী নয় আর,
কোকিলের গান ব্যবহৃত হয়ে গেছে।

আধুনিক নরকবিশ্ব, আধুনিক নগরবিশ্ব, কোকিলের গানও ক্রমাগত ব্যবহৃত হয়ে যাচ্ছে বলে সত্যি - মিথ্যের ধন্দ আমাদের আর কিছুতেই কাটতে চাইছে না । যেমন ধন্দের মধ্যে আমাদের ফেলে দিয়েছে এই কবিতার হরবোলা ছেলেটা। এই ধন্দ অনুভব করতে করতে ক্রমশ প্রশ্ন জাগে আমাদের মনে। তাহলে ? কি এই কবিতাটা বসন্তের পিপাসিত প্রচার ? ব্লাক থেকে স্লোগানের দিকে যেতে যেতে, কিংবা, স্লোগান থেকে ব্লাকের দিকে আসতে আসতে কবি সুভাষ ফুল ফুটুক না ফুটুক কবিত ার মতো এমন অনেক কবিতা লিখেছেন যা বাংলা কবিতার সম্পদ বিশেষ। আমরা কি ভুলতে পারব কোনোদিন সহজিয়া কবিতাটি ? ভুলতে পারব যত দূরেই যাই ? ভুলতে পারব ফিরে ফিরে? কিংবা সেই অনবদ্য মিছিলের মুখ ? এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় কবি সুভাষের দুটি গুত্বপূর্ণ মন্তব্য। শক্তি চট্টোপাধ্যায় -এর পদ্যসমগ্র ১ গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে বসে তিনি প্রথমে বলেছেন -- মন্ত্র থেকে কবিতার জন্ম এবং কিঞ্চিৎ পরেই বলেছেন ---মেশাল দিলে তবেই লোহা ইস্পাত হয়। অ ামরা তাঁর এই দুই চকিত মন্তব্যের মিশ্রণজাত প্রক্রিয়ায় বলতে পারি যে নিজের কবিতার ক্ষেত্রে তিনি শুধু লোহাতেই নয়, মন্ত্রেও মেশাল দিয়েছেন অত্যন্ত সার্থকভাবে। আর তাই ব্লাক ও স্লোগান এমনভাবে মিশে আছে তাঁর কবিতায়, দেখে মনে হয়, যেন-বা জীবন ও স্বপ্ন একেবারে মর্মমূলে অভিন্ন হয়ে গেছে।

।। তিন ।।

সব অর্থে সমাজসচেতন একজন কবি আমূল ভাববীজের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে যে কতখানি অন্তরতম সত্তার কবি হয়ে উঠতে পারন, কবি সুভাষ তার অনাবিল চিহ্ রেখে গেছেন জল সইতে (১৯৮১) কাব্যগ্রন্থের যাচ্ছি নামক আরও একটি কবিতায়। তাঁর কবিসত্তার এবং কাব্যদক্ষতার চূড়ান্ত উন্মোচক এই কবিতা। পড়তে পড়তে মনে হয় যেন আত্মমন্থনের এবং আত্ম - অতিক্রমের নিঃশব্দ স্বগতোক্তির সঙ্গে মিলেমিশে যাচ্ছে জীবনের সমস্ত ইমেজ। কবি সুভষের সারাজীবনের ছড়ানো বোধ ও অনুভব যেন-বা আরও সংহত হয়ে এসেছে কবিতাটির অনবদ্যবয়নশিল্পে। কবিতাটি শুধু জীবনকে ভালোবাসার কবিতাই নয়, জীবন থেকে বিদায় নিতে নিতে নতুন করে জীবনে ফিরে আসবারও কবিতা। বলা যায়, এই কবিতায়, কবি সুভাষ, দু-ভাবে নিজেকে দেখেছেন। প্রথমত তাঁর একটা সত্তা জীবন থেকে চলে যাচ্ছে, সেইজন্য বিষাদ। দ্বিদায়ত তাঁর অ ারও একটাক সত্তা জীবনে ফিরে আসবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, সেইজন্য উল্লাস। বিবাদ ও উল্লাসের রসায়ন তিনি সমগ্র কবিত ায় যেভাবে করেছেন, তা থেকেই বোঝা যায়, তাঁর কবিতা কোনোদিনও মতবাদের কবিতা হয়ে থাকতে চায়নি, চেয়েছে ভ

ালোবাসার কবিতা হয়ে উঠতে। কবিতাটির উৎসবীজ যেন - বা সেই রবীন্দ্রনাথের ১৮ সংখ্যক ছিন্নপত্র, যেখানে একদা লেকা হয়েছিল

ঐ-যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি -- ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা - সুদ্ধে দু হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবার কাছ থেকে আমরা যে-সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন - কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম ? স্বর্গ আর কী দিতে জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা দুর্বলতা- ময়, এম্ন সকণ আশঙ্কাভরা, অপরিণত এই মানুষগুলোর মতো এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত। আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে, এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসার লোক ালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্ত্য হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগ্যরা তাদের র াখতে পারিনে, বাঁচাতে পারিনে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচার াপৃথিবী যতদূর সাধ্য তা সে করেছে। আমি এই পৃথিবীকেভারি ভালোবাসি। এর মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে --- যেন এর মনে মনে আছে, আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালোবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারিনে।আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারিনে। জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতেপারিনে। এইজন্য স্ বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরও বেশি ভালোবাসি....

রবীন্দ্রভাবনার এই গদ্যাংশকে সার্থকভাবে আত্মস্থ করেই যেন-বা কবি সুভাষ চলমান জীবনের ধবনিস্রোতে কান পাতলেন। যাচ্ছি কবিতাটির প্রত্যেকাট জোড়াবাঁধা সংযুক্তিনির্ভর শব্দ ঘুরে ঘুরে একটা ধ্রুবপদই বলেছে আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালোবাসি। দীর্ঘদিন পৃথিবীতে বসবাস করতে করতে ব্যক্তিবিশ্ব এবং বস্তুবিশ্বের মধ্যে গড়েওঠে এক আন্তিক সম্পর্ক, যা ক্রমশ আমন্ত্রণমূলক মায়াবাস্তবের জন্ম দিতে থাকে। এই মায়াবাস্তব ক্রমাগত অঙ্কুরিত হচ্ছে বলেই মানুষ যাচ্ছি করেও চট করে জীবনের প্রেক্ষাপট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে না বা প্রত্যাহার করে নিতে পারে না। এই মায়াবাস্তবই তার ক্ষত, এই মায়াবাস্তবই তার শুশ্রূষা। এই মায়াবাস্তই তার তৃপ্তি, এই মায়াবাস্তবই তার ভাঙাচোরা উত্তরণের দর্পণ। এই মায়াব াস্তবের সঙ্গে থাকতে থাকতে ক্রমশ মানুষ ক্রমশ বুঝতে পারে ছুঁচসুতো থেকে শু করে কাঠের পিঁড়ি এইসব কিছুরই নির্দিষ্ট গুত্ব আছে যথাযথ স্থান। অর্থাৎপুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবতার সবকিছুই নিয়েই সে। চলমান জীবনে কাউকে বাদ দেওয়া যায় না, তুচ্ছ যা না কোনো কিছুকেই। সুতরাং মানুষেরও পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে সংলগ্ন বাস্তবতার জড় ও অজড় প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে আত্মিক জ্ঞাপন করা উচিত। কারণ ঝিঁঝি, ঝাউ, জল, ঝড়, আম, লিচু, গ, মহিষ, খ াম,পোস্টকার্ড, শীত, বসন্ত, চিনি, আয়না, মিছিল, পতাকা, নদী, মাঝি, রোদ, ছায়া সবাই তো তাকে তার জীবনকে সবসময় না চাইতেই সঙ্গে দিয়ে গেছে। কার গুত্ব কতখানি তা কি কোনোভাবে বলা যায় ? কবি সুভাষ জানেন, মানুষকে যখন যেতে হয়, তখন তাকে অনেক কিছু ছেড়ে তবেই যেতে হয়। আতমায় টান পড়ে। সেই টান থেকে তিনি লিখছেন

ও মেঘ
ও হাওয়া
ও রোদ
ও ছায়া
যাচ্ছি
ও খড়
ও কুটো
সাচ্চা ও ঝুটো
যাচ্ছি
ও লেপ

ও কাঁথা
ও বই, ও খাতা
যাচ্ছি
ও শু, ও শেষ
সমকাল
দেশ
যাচ্ছি

কবিতায় এরকম বহু স্তবক যা অনন্ত পথ এবং অনন্ত যাত্রার ধবনিময় আমন্ত্রণ ত্রমাগত একটানা মানুখের সামনে সৃষ্টি করে চলেছে। যেকোনো একটি স্তবক যেখান থেকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে সে স্বচ্ছন্দে পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা হিসাবে ব্যবহ ার করা চলে। লক্ষণীয় স্তবক - গৃহীত শব্দগুলো এমনভাবে সরে সরে যাচ্ছে, যেন - বা সেখানেই তৈরি হচ্ছে একটা সাদা শূণ্যস্থান, সেখানেই তৈরি হচ্ছে একটা পর্যায়ত্রমিক যাত্রাপথ। একটা মানুয চলে যাচ্ছে, যে মানুষটা এতদিন জীবনের অংশ ছিল, পৃথিবীর অংশীদার ছিল। মানুষটার চলে যায়ার গতিভঙ্গি যেন - বা স্পষ্ট করে তোলা হচ্ছে ব্যবহৃত শব্দবন্ধে। একে কি আমরা মুদ্রণচাতুর্য ভেবে নেবে ? নিঃসন্দেহে নয়। এই বিন্যাসত্রমে আমরা পাচ্ছি সেই চিরকালীন অমোঘ যাত্র ামন্ত্র -- কবি সুভাষের কবিতাকে যা একরৈখিক স্লোগানের দায়বদ্ধতা থেকে অনেকখানি মুক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু এমন শব্দনির্ভর শিল্পত্ব কি সবাইকে খুশি করেছে ? আমরা জানি করেনি। আর এখান থেকেই দেখা দিচ্ছে সমস্যা। তিনি যখন আগ্রাসী অগ্নিগর্ভ সমাজসচেতন কবিতা লিখেছেন, তখন অনেক সমালোচকই তার মধ্যে শিল্পের অভাব লক্ষ করেছেন। অ ার তিনি যখন আত্মিক পরিত্রমার শুদ্ধ ইঙ্গিতগুলো কবিতায় ধারণ করতে শু করলেন, তখন আবার একদল সমালোচক ত ার মধ্যে সমাজচেতনার অভাব দেখে ত্রাহস্পর্শ পেলেন। এই সূত্রে আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র ঘূর্ণিস্রোতে, সৃজনী সংরাগে-র শিকড়সংলাপ অংশ দেখে নেওয়া। যেতে পারে, যেখানে কেউ কেউ যাচ্ছি কবিতায় কবি সুভাষের compromise লক্ষ করেছেন। আমরা এক্ষেত্রে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি দিলখোলা বিবৃতির স্মরণ নেব। আনন্দবাজার পত্রিকা-য় (১৪ এপ্রিল ১৯৯২) তিনি তাঁর তিয়াত্তরে পা দিয়ে নিশ্চিন্ত গদ্যে বলেছিলেন

গত কয়েক বছরে সুভাষদা গুটিকয়েক সাংঘাতিক কবিতা লিখেছেন, তার মধ্যে দুটো লেখার কথা বলতেই হবে। প্রথমটি যাচ্ছি আর দ্বিতীয়টি একটু পা চালিয়ে ভাই। যাচ্ছি কবিতার মধ্যে এমন একটা চাপা বিদায়ের সুর আছে, যা খুব কম কবির হাত দিয়ে বেরোতে পারে। এ কালো একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা যাচ্ছি। আটপৃষ্ঠার এই কবিত যেমন সহজ, তেমনি কঠিন। নয়তো লেখাই যেতো না ও দেহ ও প্রাণ যাচ্ছি। পড়তে পড়তে গোটা কবিতাটি একটা মন্ত্রের মতো লাগে। এই ভালোবাস া, এই বিদায় --- এখন সুাষদার কবিতায় লেগেছে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন। এই কবিতাটি যেমন সহজ, তেমনই কঠিন। মায়াখোলস খুলবার আত্মযন্ত্রণাএবং পুনর ায় মায়াখোলস পরবার আত্মামুগ্ধতা এই কবিতায় এমন ভাবে মিলে মিশে আছে যা ত্রমশ এক সর্বকালীন আবেদনে অ াচ্ছন্ন করে দেয়। প্রত্যেক কবির একটা দাঁড়াবার মতো জায়গা থাকে। নিজের মতো করে দাঁড়াবার জায়গা। সেই জায়গাট া --- যেখানে দাঁড়িয়ে কবি নজেও একবার নিবিড় আন্বেষে দেখে নিতে থাকেন তার ক্ষতা, তার দগ্ধতা, তার দীর্ঘশ্বাস, তার স্খলন এবং তার উদ্‌বেলিত আশাবাদকে। সেই জায়গাটা -- যেখানে দাঁড়িয়ে কবি নিজেও যেন কিছুটা চঞ্চল বিশ্লেষক। অতীত, বর্তমান, ভবিষৎত জুড়ে দেখছেন আর দেখতে দেখতে নিজেকেও দ্রুত মিলিয়ে নিচ্ছেন প্রত্যহিক চাহিদাপূরণের ব্যর্থতা ও সফলতার ক্ষণকানীল জীবনস্রোতের সঙ্গে। এমন একটা নিজের মতো দাঁড়াবার জায়গা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় আদি, মধ্য ও অন্তেও আছে। জায়গাটা হল বহুবিচিত্র জীবন। বলা যায় জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চুষতে চুষতে তিনি যাপিত জীবনের ঘ্রাণই সবসময় যুক্ত থেকেছেন। প্রচলিত বা তথাকথিত সমাজসচতেন কবিদের থেকে ঠিক এখানেই তিনি এগিয়ে আছেন। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ আবশ্যক। কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর সময়ের জলছবি

গ্রন্থের কবিতালেখার নেপথ্য নামের স্মৃতিচারণমূলক গদ্যে কবি সুভাষের এক বিশেষ কারিগরি স্বভাবের কথা বলেছেন। তিনিজানিয়েছেন

ল্যাম্প বা তার তুল্য অন্য কোনো যন্ত্রপাতি, ঈষৎমাত্র বিগড়ে গেলেই সন্তর্পণে সরানো থাকত, সুভাষদা এলে সারিয়ে দেবেন। ঘরে ঢুকে এ-রকম সারাই সম্ভাবনার খবর পেলে খুশি হয়ে ওঠে তাঁর চোখও কাজেও লেগে যান। ঝটপট খুলে ফেলেন সব, তারপর আবার নতুন করে গড়ে তুলবার পালা। সেই তারপরটাতেই ঘাটে যায় একটু সংকট। অনেক্ষণ অনেকরকম সাজাইবাছাই করবার পর আচ্ছা এগুলি এইরকমই থাক এখন, পরে আবার আসব আমি বলে উঠে পড়েন তিনি...

শুধু ল্যাম্পই নয়, ঘড়ির ক্ষেত্রেও কবি সুভাষ বারবার তাঁর এই মৌল স্বভাবের পরিচয় দিতেন। সারাতে পারতেন, এমনট া নয়, তবু চেষ্টা করতেন ক্রমাগত। চলমান জীবনের ক্ষেত্রেও আসলে তিনি এখন ভূমিকাতেই স্বস্তি পেতেন বেশি। যেখানে যথ ক্ষতস্থান দেখতেন, তার সারাইসম্ভবনা-র পথ খুঁজতেন পাগলের মত। আমাদের দেশে ক্ষতস্থানের কি শেষ আছে ? তবু, তবু, এক-একজন এমন মানুষ থাকেন, কবি সুভাষের মতো এমন মানুষ, যারা জীবনের সবস্তরে ঢুকে পড়েন,ক্ষতস্থ ানগুলো দেখতে দেখতে, সারাইসম্ভাবনার নানা রকম পদ্ধদির দিকে যেতে যেতে, একসময় তিনি বুঝিয়ে দেন ---ব্লাকস্লোগ ান কিচ্ছু বোঝান না তিনি, শুধু বোঝেন ভাঙাচোরা জীবনটাকে সারাই করতে হবে। নানা দিকে থেকে সারাই করতে হবে ... ...

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com